আমার সহজপাঠ

শিপ্রা ঘোষ

‘কর, খল’ প্রভৃতি বানানোর তুফান’ কাটিয়ে সবেমাত্র কূল পেয়েছেন তখন। আর, তারপরই বালক রবীন্দ্রনাথের শৈশবচৈতন্য ভরে গিয়েছিল ‘জল পড়ে পাতা নড়ে’র মিলের ঝংকারে। ‘জীবনস্মৃতিতে’তে লেখা, ‘বর্ণপরিচয়’ -এর কাছে এই ঋণ স্বীকারের কথা কে না জানে। ‘বর্ণপরিচয়’ আমাদেরও অভ্যাসে মিশে গেছে। তবে আমাদের অনেকেরই শ্রুতি - স্পর্শ দৃশ্যের উপর কবে থেকে একেবারে বিছিয়ে আছে ‘সহজপাঠ’এর নানা উচ্চারণ —‘কচুপাতা থেকে টুপ্ টুপ ক’রে হিম পড়ে। ঘাস ভিজে। পা ভিজে যায়। দুখী বুড়ি উনুন - ধারে উবু হ’য়ে বসে আগুন পোহায় আর গুন্‌গুন্ গান গায়।’ বিপজ্জনক ভাবে নাগরিক হতে হতেও, কোন্ শৈশবের বোধে মিলে যাওয়া ‘কুমোর পাড়ার গোরুর গাড়ির মন্থর গ্রামীণ চাল এখনো অপ্রাসঙ্গিক হয় নি আমাদের কাছে।

‘সহজপাঠ’ (১৩৩৭) প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগের দিকে তাকালেই মনে হয় যে, শব্দের - বর্ণে, অ-কার - উ কার এ-কার মিলেমিশে সহজপাঠে একটা ভরাভর্তি গল্পকথার জগৎ গড়ে উঠেছে। এখানে বর্ণগুলি, স্বর এবং ব্যঞ্জনগুলি প্রথম থেকেই এক - একটি চরিত্র। তারা আমার সঙ্গে ‘আমি’ হয়ে যেতে পারে। ‘বর্ণপরিচয়’ বা ‘হাসিখুশি’র* ‘আ’ ‘আনারস’ বা ‘আম’ হয়ে গাছে ঝুলতে থাকে। সেই ফলটির সঙ্গে এবং বর্ণটির সঙ্গেও নবীন পড়ুয়ার এক-পা হলেও দূরত্ব তৈরি হয়ে যায় — ‘আমটি আমি খাবো পেড়ে’। দ্রষ্টা বা ইচ্ছুক ভোক্তার সঙ্গে স্বভাবতই ভোজ্যটির একটি অভিন্ন সম্পর্ক তৈরি হতে পারে না। ঈগলপাখির শিকার হবার আশঙ্কায় ইঁদুরছানা ভয়ে মরলে, কিংবা ঐ একটু দূর গিয়ে এক্কাগাড়ি ছুটে গেলেও, আমি কিন্তু দ্রষ্টাই আমি ঈগলপাখিও নই, ইঁদুর ছানাও নই।

এদিকে রবীন্দ্রনাথের ‘সহজ পাঠ’ প্রথম ভাগের স্বর-ব্যঞ্জনেরা শুধু এক্কা গাড়ি বা ভীতু ইঁদুরছানার মতো নিছক জড় বা মানবেতর নয়, বরং তারা সব বিশিষ্ট গোছের ব্যক্তি। ‘ই’, ‘ঈ’ এখানে নিজে বসে ক্ষীর -খই খায়, যেন তারা একেক জন মায়ের সোনার চাঁদ খোকনটি। ‘উ’, ‘ঊ’ – দুঃখে না আনন্দে, কে জানে —‘ডাক ছাড়ে ঘেউ ঘেউ’। আকাশে ঘন কালো মেঘ করে এলে ‘ঋ’ - বেচারীর মেজাজ তেমন ভালো থাকে না; ‘দিন বড় বিশ্রী’ বলে সে নিজের অনুযোগ জানায়। ‘এ-ঐ’ -এর আবার সবুর কম, বাটি হাতে নিয়ে ‘দে দৈ’ বলে তারা চেঁচিয়ে সারা হয়ে যায়। ‘সহজপাঠ’ -এর প্রথম ভাগ প্রথম অধ্যায়ে লক্ষ করলেই দেখা যাবে, এখানে স্বরবর্ণেরা ক্ষীর - খই - দই - ভাতে বেশ মাখোমাখো হ’য়ে আছে।

ব্যঞ্জনবর্ণেরা কিন্তু এত আহ্লাদে গোছের নয়। তারা সব খাটিয়ে কর্মী। একটু যেন শ্রমিক - শ্রমিক অহংকার আছে তাদের। যেমন, তাকিয়ে দেখুন ‘ক খ গ ঘ’-র দিকে। তারা চারে মিলে গান গেয়ে জেলেডিঙি বেয়ে চলেছে। ‘চ ছ জ ঝ’ বেরিয়েছে হাটে যাবে বলে। তাদের সঙ্গে আছে বোঝাই করা পসরা। ‘ঙ’ তো চরে বসে ধোঁয়া খায় আর রাঁধে। ‘প ফ ব ভ’-র কিছু ফুরসত নেই, তারাও আছে মাঠে ধান কাটার কাজ নিয়ে এদের মধ্যে একটুখানি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরছে ‘ত থ দ ধ’, কখন কোন্ গাছ থেকে ক’টি আম পেড়ে আনা যাবে, এটাই তাদের বাহানা। সকলের বেদম কাজের ফাঁকে তারা যেন একটু হাওয়ায়-হাওয়ায় দোল খেয়ে নিচ্ছে। খুকী ‘ঞ’র - খিদে পেয়েছে, সে শুয়ে শুয়ে খিদের কান্না জানাচ্ছে। রান্না করার চর, শিশুর শুয়ে থাকবার জমিটি, —এসব কিছুর আনাচ - কানাচ থেকে এখন একটা ঘর - সংসারের মুখ উঁকি দিতে থাকে। আর, সেই সংসারে শিশু - সদস্যের মতোই আছে ‘হ’ ‘ক্ষ’ -র মতো দুই বৃদ্ধ; তাঁরা কোণে বসে কেবল কাশে ‘খ ক্ষ’-র একঘেয়ে ঢঙে।

এভাবে প্রথম থেকে সহজপাঠের স্বর-ব্যঞ্জনদের রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে দিয়েছেন আমাদের চেনাশোনা - জন আর ঘর - সংসারের দিকে। শিশু বা শিশু - ভিন্ন অন্য পাঠকও সহজে এসব ‘ত থ দ ধ’-র একজন হয়ে উঠতে পারে। শিশুমাত্রেই হয়তো ‘দে দৈ’ বলে তার ছোট্ট হাতটি বাড়িয়ে দিল, আর সঙ্গে - সঙ্গেই যেন মনে হয়, ‘এ ঐ’র পাশে তার মুখটিও দুলে উঠল।

‘ই, ঈ’ কিংবা ‘চ ছ জ ঝ’-র সঙ্গে ভাবসাব হলেই, প্রথম ভাগ প্রথম পাঠে রবীন্দ্রনাথ শিশুর চোখকে ফিরিয়ে নিয়েছেন প্রকৃতির দিকে। এখানে এসেই দেখব, বন - গাছ, জল - আকশের চরাচর ছেয়ে থাকা রূপ আর সেই প্রকৃতি জুড়ে ঘুরে বেড়ানো পশুপাখি জগতের দিকে চোখ মেলতে মেলতে চলেছে শিশু। (আমরা সবাই জানি রবীন্দ্রনাথের সেই বিশ্বাসের কথা যে ‘বিশ্ব প্রকৃতি’-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েই যা - কিছু জানবার, তা শিখতে হবে শিশুকে; ‘জলস্থ - আকাশ বায়ুর চিরন্তন ধাত্রীক্রোড়’ থেকে ‘অমৃতরস’ আকর্ষণ করে নিতে নিতে। প্রকৃতির সঙ্গে ‘ভাবের’ এবং ‘কাজের’ ও সম্বন্ধে যোগ দিতে দিতেই সে পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠবে। (‘শিক্ষাসমস্যা’/‘শিক্ষা’) তাই স্বরবর্ণ - ব্যঞ্জনবর্ণগুলির সঙ্গে হাত - ধরাধরি ক’রে সহজপাঠের পড়ুয়া - শিশুটিকে আড়াল থেকে তার গুরু নিয়ে গেলেন প্রকৃতির কাছে। সে শুধু বর্ণগুলি মিলিয়ে যুক্তাক্ষর - বর্জিত শব্দ তৈরি করতে শিখল না। তার বেশ কার্যকারণ বোধ, সম্বন্ধ-অসম্বন্ধ বোধ হতে শুরু করেছে এবার। এখন সে জানে ‘বনে থাকে বাঘ— গাছে থাকে পাখি।

তারপরই কিন্তু, একেবারে হঠাৎ, 'আলো হয়, গেল ভয়' বলে বনময় বয়ে বেড়ানো বাতাসের সঙ্গে ঝম্‌ঝমিয়ে বাঁশগাছেদের নাচ শুরু হয়ে যায়। আর, এবার এই প্রকৃতিপাঠে সামিল খুদিরাম, মধুরাম, জয়লাল, অবিনাশ, দিননাথদের মতো চরিত্র। তারা কেউ জাম পাড়ে, কেউ খেয়া বায়, কেউ -বা ঘাস কাটে আর চাষ করে। কেউ ভাতও রাঁধে।

প্রথম ভাগের শুরুতে চেনা - জানা হয়েছিল সেই চারজনের সঙ্গে, যাদের নাম 'প' 'ফ' 'ব' 'ভ', তারা সব ধান কাটার কাজ করত। আর, এখন দেখব, চাষ করে গুরুদাস। অবিনাশ ঘাস কাটে। 'প ফ ব ভ'-র পাশে আরো এক - একটা নাম এখন বসে পড়তে পারে— গুরুদাস কিংবা অবিনাশ। 'প-ফ'-রা যে কাজ করে, গুরুদাসও তা-ই করে; আর গুরুদাস-অবিনাশ যদি পারে, তাহলে আমিও পারি! তাই পঃফ-বঃভঃ গুরুদাশ - অবিনাশের পাশে হাইফেন দাগিয়ে আমিও আরেকজন হয়ে উঠেছে। শিশুর কাছে বর্ণমালা ব্যক্তি আর প্রকৃতি জগৎ মিলেমিশে যেতে থাকে আর সেজগতে সে-ও একজন হয়ে ওঠে। বর্ণপরিচয়ের মধ্য দিয়েই সে সমাজ পরিচয়ের কাছে এসে দাঁড়ায়।

ধ্বনি কী, বর্ণ কী, শব্দের সঙ্গে পদের সম্পর্ক কী, ব্যাকরণের হিসেব মতো এসব জানতে - জানতেই একদিন ভাষার পাঠ এগোবে। কিন্তু সে'সব শুকনো কথায় যাবার অনেক আগেই সহজপাঠ ধ্বনি-বর্ণ-শব্দের একেবারে ভিন্ন একটি পরিচয় আবিষ্কার করে দেয়। এরা সবাই তখন নবীন পড়ুয়াটির সঙ্গী। এদের নাক-চোখ-মুখ আছে। ভাষা আছে, কান্না আছে, খিদে আছে তাই রান্নাবান্নাও আছে। এরা সকলে মিলে একটা সমাজ এবং সংসার। ধ্বনি-বর্ণ-শব্দ - বাক্যের এর চেয়ে কোন সত্য পরিচয় শিশুর কাছে থাকতেই পারে না। ব্যকরণ শাস্ত্র যদি তাতে ছড়ি পাকিয়ে গুরুমশাইগিরি করে, তাহলে আমরা তাকে বলব, তার শাস্ত্র নিয়ে সে ব'সে থাকুক, সহজপাঠে বর্ণগুলি যে ব্যক্তিপরিচয় লাভ করেছে। তা হলো 'আরো সত্য'।

দ্বিতীয় পাঠ থেকেই কিন্তু এই সমাজ ছবিটাই ক্রমশ আরো মজবুত কাঠামো পেতে থাকে। দ্বিতীয় পাঠের শুরুতেই আমাদের কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল লাল - শাল পরা, হাতে সাজি নেওয়া রাম। তার বাড়িতে পুজো। সে বেশ ঘটার আয়োজন। নানা লোকের ব্যস্ততায় পুজোর কাজ এগোয়। 'কত লোক খাবে। কত লোক গান গাবে।' পুজো - গান খাওয়া দাওয়ায় একটা বিপুল সামাজিকতার স্রোত ধরা পড়তে থাকে। 'আ'-কারে 'ই'-কারে 'উ' - কারে 'ও'কারে মিলে সামাজিক ছবি উপ্‌চে পড়ে। আবার, একই সঙ্গে লক্ষ করার মতো যে, 'বেল ফুল সাদা। জবা ফুল লাল'। —এই রঙের জগতে চোখ ডুবিয়ে দিতে দিতেই, কানে বাজিয়ে দেওয়া হয় ঢাক - ঢোল জমজমাট পুজোর বাজনা, আর ঘ্রাণ ভরে যায় ধূপ - ধূনোর গন্ধে— (ঢাক বাজে, ঢোল বাজে। ঘরে ঘরে ধূপ - ধুনা। ...থালা ভরা কৈ মাছ, বাটা মাছ। সরা ভরা চিনি ছানা। গাড়ি গাড়ি আসে শাক লাউ আলু কলা। ভারী আনে ঘড়া ঘড়া জল। মুটে আনে সরা খুরি কলাপাতা। রাতে হবে আলো। লাল বাতি। নীল বাতি। কত লোক খাবে। কত লোক গান গাবে ইত্যাদি।)

ঢাক - ঢোলের বাজনার কথা উঠে পড়লো বালেই, এ'কথা একেবারেই বলে নেওয়া যায় যে এখানে আরেকরকম সংগীতের আয়োজনও আছে। ধ্বনির ছন্দোময় সংগীত। তাঁর বালকবেলার চৈতন্যকে আলোড়িত ক'রে তুলেছিল 'জল পড়ে পাতা নড়ে'র অনুরণন। (স্মৃতি হয়তো একটু বঞ্চনাই করেছে এখানে রবীন্দ্রনাথকে। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' নয়, এর যথার্থ পাঠটি হলো — জল পড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে।' তবে, তাতে মিলের প্রবাহ বা ধ্বনির অনুরণনের কোন ঘাটতি হয় না। 'বর্ণপরিচয়', প্রথম ভাগে '৮পাঠ' অংশটি একবার যথাযথ পড়ে নিলেই তা বোঝা যাবে— 'কাক ডাকিতেছে। / গরু চরিতেছে। / পাখী উড়িতেছে।/ জল পড়িতেছে।/ পাতা নড়িতেছে।/ ফল ঝুলিতেছে।') 'সহজপাঠ' লিখতে বসে একবার অন্তত ছন্দপাঠ শিখিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, 'কাল ছিল/ডাল খালি' অথবা 'কাল ছিল ডাল/খালি/আজ ফুলে যায়/ ভ'রে' — এই দুরকম পাঠভঙ্গির কথা নির্দেশ করে। কিন্তু, মনে হয়, এসব জায়গায় নয়, শব্দের বিন্যাস থেকে আপনিই ছন্দের সংগীত ছড়িয়ে পড়েছে আসলে এর গদ্য-অংশগুলিতেই—

'বেলা হল। মাঠ ধূ ধূ করে। থেকে থেকে হু হু হাওয়া বয়। দূরে ধুলো ওড়ে।

চুনি মালী কুয়ো থেকে জল তোলে আর ঘু ঘু ডাকে ঘু ঘু'। (প্রথম ভাগ/ পঞ্চম পাঠ)।

ধন্যাত্মক শব্দগুলি দীর্ঘ প্রসারিত স্বরের দাক্ষিণ্য পেয়ে ছন্দের একটা ঘূর্ণি তৈরি করে দেয়। গদ্য কথাই তখন ছন্দের দিকে এগিয়ে যায়।

ফিরে আসা যাক রামের কথায়। তার পুরনো আদ্যিকালের নামটা মেনে নেওয়াই যা একটু সমস্যা। একবার মেনে নিলে রামকে পছন্দ হতে আমাদের দেরী হয় না। কারণ, রামের গায়ে লাল শাল। দাদাকেও আমাদের পছন্দ হবেই। কারণ, দাদারও গায়ে লাল জামা। আর, আরেকটা কথা হলো। এই যে, রামের হাতে বই নয়, ফুলে সাজি। দাদারও পড়াশুনোর বলাই নেই, হাটে চলেছে। যারা সবাই লাল জামা পরে, আর কেবলই ফুল তুলে বেড়ায় কিংবা খাজা-গজা কেনে, তাদের ভালো না-লাগার জো নেই। সবচেয়ে বেশি মন টেনে নেয় কিন্তু আশাদাদা। আশাদিদি হলে কী হতো বলা যায় না, কিন্তু 'আশাদাদা' শুনলেই কান জুড়িয়ে যায়। এই আশাদাদা এসেছে ঢাকা থেকে। সে খাবে বলেই না খাজা চাই, গজা চাই, ছানা চাই! আশাদাদা এলো, আর কালই তার ভাই চলল ঢাকার পথে। দূর

থেকে আসা দূরে ফিরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে ব্যাপ্তির একটা বোধ দৈরি হতে থাকে।

পুজোর দিন, হাটে যাবার খুশি, ছুটির চড়িভাতি — এইসব ছুটির কথা ভ'রে আছে সহজপাঠের লেখা। কী খাওয়াদাওয়া হবে চড়িভাতিতে? খাওয়া হবে মুড়ি। আর আছে নুন দিয়ে কুল মেখে খাওয়ার সুখের কথা। কখনো আবার প্রকৃতির কাছে যাবার আরেক ভিন্নরকম আয়োজন থাকে জঙ্গল সাফ করার দিনে। শ্রাবণ মাসের বাদলায় উস্রি নদীর ঝর্ণা দেখতে যাওয়ার আনন্দই ঝরঝরিয়ে বেজে উঠেছে কখনো। এরই মধ্যে বাঘ শিকারে বেরিয়ে পড়েছেন শক্তিনাথ বাবু। তবে, বাঘের জন্য তাকে বন্দুক ব্যয় করতে হয় নি। বাঘটি বেশ নিরীহ। শক্তিনাথবাবুর সামনে এসে সে দেখা দিয়েছিল একবার, তিনি বিজলিবাতির দুটো মশাল জ্বালাতেই বাঘ দৌড় দিল। বাঘ অথবা শক্তিনাথবাবু, কারোই কোন ক্ষতি হলো না। কিন্তু শক্তিনাথবাবু জঙ্গলে পথ হারালেন। তাতেও অবশ্য কিছু সমস্যা হলো না। বনে আশ্চর্য ভালো সব কাঠুরিয়ারা আছে। তারাই শক্তিনাথবাবুকে যত্ন করে, খেতে দেয়। শক্তিনাথ ফিরে আসার সময় টাকার মূল্যে কৃতজ্ঞতা জানাতে গেলে গরিব কাঠুরিয়া - সর্দার কিন্তু টাকা নেয় না। অধর্ম হবে বলে ফিরিয়ে দেয়। আবার, বিশ্বম্ভরবাবুর ধর্মবোধের কথাই বা কী করে ভোলা যাবে! চিকিৎসক বিশ্বম্ভর তার ভৃত্য শম্ভুকে নিয়ে সপ্তগ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে ডাকাত পড়ল। শম্ভুর বিক্রমের সঙ্গে ডাকাতরা অবশ্য পেরে উঠল না। তারা কেউ পালালো। কেউ আহত হয়ে পড়ে রইল। ডাকাত হলেও আহত, দুর্বল তো! যে ডাকাতরা তাঁর প্রাণনাশ পর্যন্ত করতে পারত, তাদেরই নিজের হাতে শুশ্রূষা করে বিশ্বম্ভর। আর, সহজপাঠের পড়ুয়ারা শিখে গেল ধর্মবোধের একেবারে গোড়ার কথা। বিপন্ন শরণাগতকে রক্ষা করা ধর্ম। এর কোনো বিনিময়যোগ্য অর্থমূল্য থাকতে পারে না; শত্রুমিত্র ভেদাভেদ বোধ থাকতে পারে না।

আমরা ভুলব না দুর্লভের পিসি কাত্যায়নীর ধর্মবোধের কথাও। সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর ভূস্বামীর দ্বারা প্রজানিগ্রহের কথা রবীন্দ্রনাথ অনেকবার বলেছেন। কিন্তু এখানে শুধু জমিদার দুর্লভবাবুর প্রজাপীড়নের কথাই নেই, কাত্যায়ণীর হাতে সেই পীড়িত প্রজার ত্রাণের কথাও আছে। উদ্ধবের মেয়ের বিয়েতে দুর্লভ যত বিঘ্নই ঘটাক না কেন, কাত্যায়নী উদ্ধার করেন উদ্ধবকে। বিয়ের মাছ-মিষ্টি-লালচেলির শাড়ি, সোনার হার— এই সমস্ত উপহার নিয়ে দুর্লভের কুটিরে নেমে তিনি যেন ধুইয়ে দিয়ে গেলেন দুর্লভের সব পাপ।

সহজপাঠ তাই শুধু অ-কার ই-কার রেফ - ফলা যুক্তব্যঞ্জন বাক্যগঠন আর পদের হিসেব শেখায় না। বরং প্রকৃতিতে সামাজিক মিলিয়ে জীবনের একটা বড় প্রেক্ষাপটের ইশারা দেখায় সহজপাঠ। তারই সঙ্গে শিখিয়ে যায় আচররণীয় কিছু ধর্মের কথা।

তবু, একটা ছুটির খুশি, বাগ্যগুলির গঠন এবং বিন্যাসের মধ্যে লঘুভার এক ছন্দোময় প্রকাশ এগুলিকে একটু যেন অলৌকিক করে তুলেছে, প্রতিদিনের ধুলোর কাছ থেকে একটু দূরে সরিয়ে রেখেছে। এর মধ্যে আমি নিজের ঝোঁকেই সরিয়ে রেখেছি বিনিপিসি, বামি আর দিদিকে। শক্তিনাথবাবু যখন দাপটের সঙ্গে শিকারে চলে যান, বিশ্বম্ভরবাবু সপ্তগ্রামের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন, কেউ - বা উন্মত্ত ঝর্ণার কাছে যাবার কথা ভাবে, তখন বিনিপিসিদের যাওয়া আসাটুকু চেনা পথেই বাঁধা। কতদূর আর যাবে তারা? ঘাটে যায়। তারপর ঘাট থেকে ঘটি ভরে নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। আর পাখিটি বসে থাকে দাঁড়ে। সে ওড়ে না। তার পায়ে বেড়ি।

এই বেড়ি - পরা পাখিটি যদি সহজপাঠের গোড়া থেকেই পড়ুয়া মেয়েটিকে ভয় দেখায়, তবে বলব, মৈনিমাসি আছে না? মৈনিমাসি নৈনিতাল থেকে চৈবাসা চষে বেড়ানো মেয়ে না! তার বাবা থাকে গৈলায়। শুধু আশাদাদা নয়, দূরের হাওয়া আছে মৈনিমাসির আঁচলেও।

।। দুই।।

এই আশাদারা আর মৈনিমাসি, বিনিপিসি আর বামিদের সঙ্গে সঙ্গেই ঘাটে আসা-যাওয়া করতে থাকে ছোট্ট এক পাঠিকা। একবার ঘাটে যায় আর বাড়ি ফেরে, আর একবার চৈবাসা এবং গৈলার-র ঐ-কারের টানে মজে উঠে পেন্সিল দিয়ে -ঐ - কারের শুঁড়টাকে টেনে ঘুরিয়ে লম্বা ক'রে দিয়ে সে-ও ঘুরে আসে চৈবাসা। এই ঘর আর ঘাট, পায়ে - বেরিয়ে পাখিটি আর ঢাকা-নৈনিতালের দূরত্বময় ইশারা, এই সবকিছু কানে নিয়ে সে সহজপাঠ থেকেই 'বড়' হবার পাঠ নিতে থাকে। আর তারপর, এই 'বড়' হবার বিবিধ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে দেখে, সে তো আসলে ভিতরে ভিতরে আগলে রেখেছে একটা সহজপাঠকেই। হয়তো একটু অন্যভাবে।

ক খ গ ঘ, প ফ ব ভ-দের পাশে পাশে সেই যে নিজের মুখ বসিয়ে নিতে নিতে একটা খেলা শুরু হয়েছিল, তারপর ক-খ-গ-ঘ-রাই হয়ে গেল চারপাশের চেনা সব সামাজিক মানুষ। আর, পাঁচটি বর্গ, ছত্রিশটি ব্যঞ্জন, এগারোটি স্বর ছাপিয়ে সেই সব মানুষেরাই হয়ে ওঠে অগুন্তি। এইসব নানা মুখ আর প্রেক্ষিতের সঙ্গে বিনিময় করতে করতে, সকলের মতো নিজেকে ব্যয় করতে করতে একদিন সকলেই দেখি, সমস্ত কিছু উপার্জনের পরও নিজের সঙ্গে বয়ে বেড়াচ্ছি এক বেদনা ভরা আক্ষেপ—

'কখনো হবে না সে কি ভাবি যাহা মনে'?

সহজপাঠ প্রথম ভাগ দশ পাঠের শেষ ছড়াটি মনে আছে?

গাছে থাকা, মন উড়ু-উড়ু করা সেই ফুলটির কথা দিয়ে যে ছড়াটি শুরু হয়েছিল! বৃন্তের ডগায় বসে থেকে থেকে ক্লান্ত হতে হতে ফুলটি ভাবলো, সে আকাশে উড়বে। যেই তারা ইচ্ছে ডানা হ'য়ে নিজেকে মেলে দিল, অমনি সেই ফুল কই! সেই আর ফুল নয়। সে এখন প্রজাপতি! উড়ছে।

এ এক উড়ুক্কু সাধের দেশে যেন ঘুরে আসা গেলো। এখানে সবারই প্রথমে পায়ে বেড়ি। এবং সবারই মন উড়ু। তাই প্রদীপের আলো পাখা পেয়ে জোনাকি হয়ে উঠল। পুকুরের জল কানায় কানায় থই থই করতে করতে আকাশের পাখি দেখে উদাস হয়ে গেলো। আর, তারপর —'ধোয়া ডানা মেলে/ মেঘ হয়ে আকাশেতে গেল অবহেলে।'

সবাই পাখা পেয়ে গেলো তবে! ফুল পেলো, আলো পেলো—, পুকুরের জলও পেলো! (কতদিন ভাবে ফুল উড়ে যাব কবে।/ যেথা খুশি সেথা যাব ভারি মজা হবে।/ তাই ফুল একদিন মেলি দিল ডানা, / প্রজাপতি হল, তারে কে করিবে মানা!

রোজ রোজ ভাবে বসে প্রদীপের আলো/ উড়িতে পেতাম যদি হত বড় ভালো/ ভাবিতে ভাবিতে শেষে কবে পেল পাখা/ জোনাকি হল সে — ঘরে যায় না তোর রাখা।

পুকুরের জল ভাবে, চুপ করে থাকি, / হায় হায়। কী মজায় উড়ে যায় পাখি।/ তাই একদিন বুঝি ধোঁয়া ডানা মেলে/ মেঘ হয়ে আকাশেতে গেল অবহেলে।)

কিন্তু শেষ অবধি ছড়াটির ও-মুড়ো থেকে এ-মুড়োয় এসে একুট যেন ছমছমিয়ে উঠল না! —'আমি ভাবি ঘোড়া হয়ে মাঠ হব পার, / কভু ভাবি মাছ হয়ে কাটিব সাঁতার।/ কভু ভাবি পাখি হয়ে উড়িব গগনে।/ কখনো হবে না সে কি ভাবি যাহা মনে!'

কোন্ ছেলেবেলায় পড়া এই ছড়াটির উপর কবে যেন আঙুল রেখে বসে আছি আমরা অনেকেই। কোনদিনই এই ছড়াটি বোধহয় আমাদের ছেড়ে যায়নি। এই ক'টি লাইনের মধ্যেই হয়তো প্রথম জেগে ওঠে আমাদের সাধ। ঐ ফুল, ঐ প্রদীপের আলো, পুকুরের জলের কাছে কত সকাল - সন্ধে দাঁড়িয়ে আমাদেরও কত ইচ্ছে ডানা মেলতে চেয়েছে।

পাঁচ সাড়ে - পাঁচ বছরের সেই মেয়েটিকে সকলেই বোধহয় চিনি, অক্ষরে আঙুল রেখে রেখে যাকে এ'ছড়া পড়িয়ে ফেলেছেন তার মা। মা বুঝলেন না, রবীন্দ্রনাথও জানলেন না, সেই মেয়েটা চুপিচুপি ডানা লাগিয়ে ফেললো। (অবশ্য, বাড়ি শহরে হলেও বা কী। লোড্‌শেডিং-এর দৌলতে সন্ধে হতে না - হতেই হ্যারিকেন জ্বালিয়ে তোলার অভ্যাস ছিল শহরবাসীরও।) সন্ধে হলেই এদিক্-ওদিকে জল ছিটিয়ে, কোনিপিসি আর ঠাকুমা মিলে হ্যারিকেনের কাচটা উপর দিকে তুলে — সল্‌তের আলো জ্বেলে, আলো বেড়ে ওঠার চাবিটা ঘুরিয়ে দেবার আগেই কাচটা আবার জায়গামতো ফেলে দেয়। আর, যেই সেই কাচের ঢাকনাটা ফেলে দেওয়া হয়, অমনি মনে হয়েছে, যাঃ বন্ধ করে দিলো তো! হ্যারিকেনের আলো তবে আর জীবনে ডানা পাবে না, জোনাকিও হবে না।

কিন্তু গুছিয়ে আরো কিছু ভাববার তখন সময় থাকে না। কারণ, ততক্ষণে চোখে পড়ে গেছে, মা গলায় ঘুরিয়ে আঁচল ফেলে দিয়েছে, এবার প্রদীপ জ্বালিয়ে মাথাটা ঠাকুরের সিংহাসনে ঠেকিয়ে নমো করবে। —ব্যস্। প্রদীপ জ্বালা হয়ে গেলেই কাছে-পিঠে ঘুরঘুর করে সে। মা ভাবে, গুঁজিয়া নকুলদানার জন্য। সে'সব মুখভর্তি পেয়েও কিন্তু প্রদীপের কাছটি ঘেঁষেই বসে থাকতে হবে, সে জানে। তারপর সেই সময়টা আসে। একটুখানি দপ্ দপ্ করে প্রদীপের শিখা নিবে যায়। সল্‌তের ডগায় একটু ছোট্ট মতো গোল নিভন্ত লাল আগুনের বিন্দু আর ধোঁয়া এইত্তো! এখনই তো! এই ধোঁয়ার মধ্যে প্রদীপের আলোটা মরে গিয়েই তো জোনাকি হলো! বাব্বা! রবীন্দ্রনাথ এতও জানেন! যাক, একদিকে নিশ্চিন্ত। তখন আবার হয়তো বাইরের স্থলপদ্ম আর পেয়ারাগাছের ঝোপেঝাড়ে তাকিয়ে থাকে সে। জোনকিটা খুঁজে পেতে হবে।

কিন্তু ঐ ছড়াটাই একদিন মুড়ো থেকে গড়িয়ে ফেলে দিল ল্যাজে। একদিনে নয়, দিনে দিনে। 'আমি ভাবি ঘোড়া হয়ে মাঠ হব পার। / কভু ভাবি মাছ হয়ে কাটিব সাঁতার।' আসলে তো একটা রূপান্তরের স্বপ্ন। সকলেই এই রূপান্তর চাইছে এখানে। সে ফুলই হোক, আলোর শিখাই হোক, অথবা আমি। আসলে তো ফুলও নয়, আলোও নয়; আমারই চাওয়ার—আমারই কল্পনার আঁচ লাগলো এদের উপর। রবীন্দ্রনাথ একটু পড়া থাকলেই সকলে বলবেন, এ হলো গতিভাবনা। বের্গসঁ থেকে প্রাচ্য উৎস, কত কথাই এক - ঝলকে মনে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে এর মধ্যে রূপান্তরের একটি ভগবানও কাজ করছে বলে মনে হয়। নৃতত্ব বলছে, পাখা - ডানা- হাত এগুলি সব homologous organ। বিবর্তনের পথে এরা নানাভাবে রূপান্তরিত হলো। হয়তো তাই একের জন্য অন্যের; পাখার জন্য—ডানার জন্য—হাতের একটা টান রয়ে গেছে।

পুরানো আছে আধা-ঘোড়া আধা - মানুষ সেন্ট্যরদের কথা (থেসালির লেপিথ উপজাতির রাজা ইসিয়নের সন্তান এই সেন্টাররা অবশ্য খুব হিংস্র।) মনে পড়ে, গ্রিক পুরাণের পেগ্যাস্যাস্-এর কথা। এই ডানাওয়ালা ঘোড়া ঘুরে বেড়ায় ললিতকলার ন'জন গ্রিক দেবী যেখানে থাকেন, সেই বিয়েশিয়ায়। পা-ওয়ালা অথচ একইসঙ্গে পাখির

মতো ডানা-লাগানো সাইরেনদের কথাও মনে পড়ে। এরাও কিছু ভালো পরী নয়, গানের সুরে টেনে এনে এরা মানুষ মেরে ফেলে। তাহ'লে পুরাণেও আছে সেইসব গল্প। যেখানে শুধু হাত, শুধু পা, শুধু ডানায় কারো শান্তি নেই। এই একই কথা একটু অন্যভাবে বলছে কিন্তু ‘বিচিত্র সাধ’ -এর শিশুও। সে ‘চুড়ি চাই’ বলে ডেকে যাওয়া ফেরিওলা হতে চায়, গায়ে - মাথায় ধুলো লাগানো ফুল - বাগানের মালী হতে চায়, অথবা গলির মোড়ের পাহারাওলা।

‘আমি ভাবি ঘোড়া হয়ে মাঠ হব পার’ বললেই খানিকটা প্রসঙ্গছুট ভাবেই হয়তো আমাদের মনে পড়ে যায় রাসসুন্দরী দেবীর বলা সেই জয়হরির বৃত্তান্ত। জয়হরি তাঁর স্বামীর ঘোড়া। একদিন সেই ঘোড়ায় চড়ে এলো রামসুন্দরীর বড় ছেলে। রামসুন্দরী কিন্তু ঘোড়া বা ছেলে, কারো সামনেই যেতে পারলেন না কারণ, তিনি ভাবছেন’...কর্ত্তার ঘোড়ার সম্মুখে আমি কেমন করিয়া যাই, ঘোড়া যদি আমাকে দেখে, তবে বড় লজ্জার কথা’। এই জড়, পিঞ্জরাবদ্ধ জীবনে দাঁড়িয়ে তবু কি তাঁর মনে হয়েছিলো, খাঁচা পেরিয়ে দিগন্ত ডিঙিয়ে যাবেন তিনি? পিষে যেতে যেতেও তাঁর মনে হয়েছে, তিনি যদি ছ'টি হাত পান, ষড়ভুজা হয়ে ওঠেন, তাহলে দুই হাতে সংসার সামলাবেন, দু'হাতে সন্তান। আর বাকি দু হাত? ‘অন্য দু'টি হাতে আমার মন যেন চাঁদ ধরিতে চাহে’। এ তো সেই একই কথা— ‘আমি ভাবি ঘোড়া হয়ে মাঠ হব পার/কভু ভাবি মাছ হয়ে কাটিব সাঁতার।’ তাই রাসসুন্দরী লিখে গেলেন তাঁর নিজের জীবন।

এরেবারে নিজের নিজের মতো করে নিজেদের জড়ত্ব, অভ্যাস আর বন্ধনের ক্ষেত্রগুলি পেরিয়ে গিয়ে আকাশ - প্রান্তরের কাছে এসে মিশেছে চারুলতা-মৃণাল-প্রকৃতি বা অচিরার মতো চরিত্রগুলি। তাদের যন্ত্রণা আর আত্ম-উন্মোচনের মধ্যে দিয়েই বারবার ভূমিষ্ঠ হতে পারে আমাদের মুক্তির পথ।

নিজের ভাষায় নিজের মনের কথাটি লিখতে পেরে উড়বার আনন্দের খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল ‘নষ্টনীড়’-এর চারুলতা। ‘স্ত্রী পত্র’র মৃণাল পেয়েছে চরাচর ডিঙিয়ে চলার গতি আর পাখা। সে ডিঙিয়ে গেয়ে মাঠ। অনন্ত সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ছিঁড়ে ফেলেছে অসার সব সম্পর্কের বন্ধন। নিজের বুদ্ধি আর সাহসের জোরে, বেদনার ধাক্কায় সে ডিঙিয়ে গেছে জীর্ণ বাধা আর মলিন দিনরাত্রিগুলি। বিন্দুর মৃত্যুই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলি থেকে উদ্ধার করে মৃণালকে সেখানে নিয়ে গেলো, সেখানে সামনে নীল সমুদ্র মাথার উপর আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ। শিকল ভাঙল মেজবউ। আর তার মনে পড়ল মীরাবাঈয়ের কথা— ‘তার শিকলও তো কম ভারী ছিল না।’

‘সুদূর স্বর্গের আলো’কে নিজের অন্ধকার দিয়ে টেনে এসেছিলো প্রকৃতি। তারপর, আত্মপরাভবে ম্লান ক্লান্ত সন্ন্যাসীকে যখন ‘জয় হোক তোমার জয় হোক’ বলে সে মুক্তি দিলো, তখনই আসলে প্রকৃতি পেরিয়ে গেলো দিগন্ত।

অরণ্যের অন্ধমোহ আর ছায়াচ্ছন্ন বনের নিশ্বাস প্রবৃত্তির রাক্ষসকে জাগিয়ে তুলেছিল অচিরার মনে। বিজ্ঞানের তপস্বী নবীনমাধবকে এই রাক্ষসের বিশ হাত দিয়ে অধিকার করার একটা আদিম তাড়না জেগেছিল তার। কিন্তু যেদিন অচিরার মনে হলো ‘কী পরাজয়ের বিষ এনেছি আমরা মধ্যে’। সেদিনই সে সাধনার ক্ষেত্রে মুক্তি দিল নবীনমাধবকে। আর নিজে পেরিয়ে গেলো প্রবৃত্তির সব খানাখন্দ, মাঠঘাট।

‘নটীর পূজা’-র শ্রীমতীও যে ধর্ম এবং বাণীকে সত্য বলে জেনেছিল, তাকে সে নিজের শেষ বা চূড়ান্ত মূল্য দিয়ে যায়। রাস্ট্রীয় কর্তৃত্বকে সেখানে শ্রীমতী কোনভাবে স্বীকার করেনি। পরম ব্যথার ভিতর দিয়ে সে জেগে উঠতে দেখেছে তার নিরুপম সুন্দরকে। সেই সুন্দরই তাঁর বুদ্ধ। তাঁর কাছে যখন নিজের নৃত্যময় প্রণাম নিবেদন করেছে শ্রীমতী, তার মনে হলো ‘ডাইনে বামে ছন্দ নামে নব জনমের মাঝে’। এ-ই হলো সব সাধ্যের সীমা ভেঙে ফেলে আকাশের কাছে নিজেকে মেলে দেওয়া।

সকলেই আদিগন্ত মাঠ পেরিয়ে যেতে চেয়েছি। কিন্তু সকলেই তো আর পক্ষিরাজের ডানা পাই না। জল সাঁতরে নদী পেরনোর পাখাই বা কোথায়? নানা পেশাদারি সাফল্যের খতিয়ানের মধ্যে মাছ হয়ে সাঁতরে বেড়ানোর খুশিয়াল মেজাজটি থাকে না। এই সব সাফল্য হয়তো যথার্থ কোন রূপান্তরও আনে না। তাই, অধিকাংশ সময়ই এ-প্রান্তে দাঁড়িয়ে দূরের—ওপারের স্বপ্ন দেখা কোন বিন্দুর কাছে পৌঁছতে গিয়ে দেখি, মাঝখানের মাঠটির প্রসার আর দিগন্তই শুধু বড় হয়ে গেছে। মাঠ তো কেবলই পেরিয়ে যেতে বলে ডাকে, জলের নিচে লুকিয়ে থাকে আহ্বান। আর, আমারই ডানা মুড়ে বন্ধ হয়ে আছে।

কোন - কোন বিষণ্ণ মুহূর্তে মনে হয়, এটাই বোধহয় অনন্যোপায় আমাদের কাছে একটা সহজপাঠ। নিজেকে ছাড়িয়ে দূরে যাবার ব্যাকুল বাঁশিটি বাজবে আর ততদূর নিজেকে ছড়িয়ে দিতে গিয়ে দেখব, ঘরে- পরের চাপে, খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়েছে আমার ডানা। আজও এই ঘরের মানুষ পরের মানুষেরই বেঁধে দেবেন আমি কতদূর হাঁটব, তার মাপ এবং নিশানা।

‘নদীর ঘাটের কাছে নৌকো বাঁধা আছে’।— তবু আমরা অনেকেই মনে মনে গিয়ে দাঁড়াব একটি নদীর কাছে, নদীর ঘাটে। সেই যে বিনিপিসির সঙ্গে ঘাটে গিয়ে গিয়ে অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল! তাই নদীর সঙ্গে আমাদের কত কালের ভাব! ‘মাছ’ হয়ে সাঁতার দেওয়া তো সবার হলো না। তবু যেন চলতে ফিরতে পায়ের পাতায় ছপ্ ছপ্ করে জল বেজে ওঠে। মাঝে মাঝে অনেকেই টের পাই, বুক ছাপিয়ে গলা পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। জালে। একটা আস্ত নদীই

কি সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে নাকি? কতজনই টের পাই তার ঘূর্ণি, স্রোত-প্রতিস্রোত। আড়বুঝো মন সময় অসময় নেই, বেফিকির নেই, তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, দাঁড়াতেই হয়।

এখানেই আছে আমাদের রায়গঞ্জের ঘাট। মধুমাঝির নৌকোখানা রায়গঞ্জের ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে তো কবে থেকে, আর সেই তখন থেকেই তো জানি একশোটি পাল তুলে দেব তাতে, নতুন রাজার দেশে ভেসে পড়াই যা অপেক্ষা একটুখানি — 'মাঝনদীতে নৌকো কোথায়/চলে ভাঁটার টানে।/...থাকি ঘরের কোণে,/ সাধ জাগে মোর মনে।/ অমনি করে যাই ভেসে, ভাই/ নতুন নগর বনে।'

নদীর কাছে গিয়ে তো দাঁড়াই। কিন্তু, কোন্ নদী? কেন? সারাজীবন 'ঘরে আধা বাইরে আধা' আমাদের জন্য আর কোন্ নদী অপেক্ষা করে থাকে? অশ্রুনদী। চোখের জলে ভাসছে কত বিশু পাগলের জীবন। অল্প কিছু পাবার মূল্যে মহৎ কিছু ছাড়তে রাজি ছিল না বিশু পাগল। 'অল্প কিছু দেওয়ার দামে আমার গান বিক্রি করব না' বলে জানিয়ে দিব্বি গেয়ে গেলো নিজের পথ চাওয়ার গান। নন্দিনীর প্রশ্নের জবাবে কখনো তার অশ্রুপাথার থেকেই গড়িয়ে নামলো সুর— 'ও চাঁদ চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে।'। কিন্তু, সবাই কি অত স্পষ্ট ক'রে চোখের জলের কথাটি বলতে পারল! চেনার উপকূল থেকে কোন্ হাওয়ার টানে তরী কোথায় কোন্ অচেনার ঘাটে ভেসে যায় জীবন, পড়ে থাকে শুধু কান্নার স্রোত, ফিরে ফিরে আসে, সব সময় সে'সব কথা কেউ কি বলতে পরেছে? ঐ যে 'মেঘ ও রৌদ্র'র গিরিবালা, তার ডুরে শাড়ি পরা আট বছরের বালিকাবেলায় শশিভূষণের দিকে পাকা জামের আঁটি ছুঁড়ে যাওয়ার শৈশব দৌরাত্ম্য থেকে কত মেঘ - রৌদ্রের দিন পার হয়ে, অবশেষে সাদা থানে - ঘেরা দূরত্ব থেকে একটি প্রণাম নামিয়ে রাখলো শশিভূষণের পায়ে, সেই প্রণামটির মধ্যেও আস্ত একটি নদীই যেন ছল্‌ছল্ করছে।

এক গণ্ডূষ জলও জীবন যাকে দেয় না, সে-ও তো হাত পেতে আছে এক মহানদী বা সমুদ্রের কাছে। প্রখর তৃষ্ণা যখন শুধু মরীচিকার ছলনায় দেখায়, তখনো প্রলয়ের আগুনশিখার দহন থেকে শান্ত জলের কাছে ফিরে এসেছিল দামিনী। এপারের ঘাটটিতে সবেমাত্র থিতু হয়ে বসল সে। তখনই ওপার থেকে এগিয়ে আসে আর -এক অচেনা নৌকো— 'ওরে প্রেমনদীতে উঠেছে ঢেউ, উতল হাওয়া/ জানি নে আজ ফিরব কি না, কার সাথে আজ হবে চিনা/ ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীনা তরণীতে।'

অনন্ত না-পাওয়া আর ছেড়ে চলে যাওয়ার মধ্যে একটুখানি এক লহমার ঘাট। ঐ ঘাটটুকু জেগে আছে বলেই এত কান্না। যেন সেই ঘাটের উপর দাঁড়িয়েই বলতে হলো—'সাধ মিটিল না।' এই সব অচরিতার্থতা আর না-পাওয়ার মানে শুধু কোন বিশেষ পুরুষ বা নারীকেই না-পাওয়া নয়। কোন পার্থিব না-পাওয়াই নয় বোধহয়। বরং, 'সকল পাওয়ার মাঝে আমার মনে বেদন বাজে/ নাই নাই নাই গো'। এই না-পাওয়াই ছেয়ে আছে কত মন। 'সাধ মিটিল না'। এই কান্না অবিরল বাজছে। ক'জন নিশ্চিত করে চেনে তার 'দিনান্তবেলা'? ক'জন নিশ্চিন্ত মনে বলতে পারে — 'এ পারে কৃষি হল সারা/যাব ও পারের ঘাটে'! শুধু কর্ষণ আর ফলনের মাঝে বীজবপনের অভিজ্ঞানটুকু নিয়ে দিশেহারা- ত্রস্ত দাঁড়িয়ে আছি সবাই। ওপার থেকে ডাক আসবে জানি, মধুমাঝির নৌকোটি তৈরি আছে, আমার কৃষি সারা হলো কি না, জানি।

তবু, ঘুরি ফিরি, আনাজ কুটি, শাড়ির আঁচলে, কামিজের কোনো রান্নার ঘামতেল জমে ওঠে; আর থেকে থেকে কে না বলুন আন্‌মনা হয়ে যাই। যেন কোন্ জানলার ধারটিতে কার এসে দাঁড়ানোর কথা ছিল! এ জান্‌লা খুলি, ঐ কপাট বন্ধ করি, ব্যস্ত রাস্তায় হাঁটি আর মনে হয় কোথা থেকে আহ্বানের সুর আসে! চেনা, আধো-চেনা কত মুখের উপর ছড়িয়ে দিই উৎসুক প্রশ্নার্ত চোখ, কোন মুখেই ঠিকানা খুঁজে পাই না। তবু, টের পাই 'গন্ধ আসে, কেন দেখি নে মালা, পায়ের ধ্বনি শুনি, পথ নিরালা'। ব্যস্। 'আমি কী জানি তার নাম' — এই আহ্লাদে এবং চোখের জলে ভাসতে ভাসতে মনে হয়, যাই— নদী ডাকছে, নৌকোটি তৈরি হলো বুঝি, 'নাইতে যখন যাই, দেখি সে/জলের ঢেউয়ে নাচে।' তাই—'এবার ভেসে যেতে চায় মন— ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়/ সব চাওয়া সব পাওয়া।'

একটি 'নিঃসঙ্গতার জার্নাল' -এর কথা মনে পড়ে। শর্মিলা বসু দত্ত এই জার্নালটি যখন লিখছেন, তখন তাঁরও সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অন্যপারে যাবার একটি নৌকো, বড় অসময়ে এসেছে তাঁর মাঝি। 'সাধ মিটিল না'—এই কান্না ছল্‌ছলিয়ে বাজছে 'নিঃসঙ্গতার জার্নাল' -এ। লিখছেন 'আজও মেঘ জমে। আকাশে ও মনের কোণে। মেঘ জমলে সংসার, চাকরি, ব্যস্ততা এসব নিয়ে আপাতসুখী মানুষ হঠাৎ যেন কোথায় হারিয়ে যায়। ঘরের মানুষ তখন পর হয়ে যায়। মনে হয়, কী যেন পাবার কথা ছিল! কী যেন পাওয়া হলো না! কাকে যেন পাওয়ার কথা ছিল, কে যেন জীবনে ধরা দিল না।' —তাই একা পড়ে আছি, নির্বাসনে আছি। তবু ঐ যে, থেকে থেকে অজানা গন্ধ আসে, উৎকর্ণ হয়ে থাকি—'পরান আমার ঘুম জানে না, জাগা জানে না।' কেবল থেকে থেকে নাভিমূল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে নদীজল জেগে ওঠে।

পরীর জন্য রাজকুমারের উতলা - মনের কথা এইখানে একটু বলে নিতে ইচ্ছে করে। 'লিপিকা'-র 'পরীর

পরিচয়' - তে পাগলা বলেছিল রাজাকে যে, পরীকে দেখা গেলেও তাকে চিনে নিতে পারাটাই কঠিন। কিন্তু সে তো 'পাগলা', তাই সে পরীর খবর জানত। কখনো সুর আর কখনো আলো, এরাই তাকে পরীর ঠিকানা জানিয়ে দিত। এসব কথা শুনে রাজা খুব বিরক্ত। রাজপুত্র কিন্তু পরীর টানে মজল। উদাস ঝোরার পাশে বসা নিল একা রাজকুমার। একদিন তার কানে স্বপ্নের ভিতর বেজে উঠল বাঁশির সুর। রাজপুত্র ভাবলো 'আজ পাবো দেখা।' পরীর সঙ্গে সত্যিই তার দেখা হলো কি না, সে এক অন্য রহস্য।

জাগা আর ঘুমের আড়ালে আড়ালে আমরাও বসে আছি এক অনন্ত অপেক্ষায়। কাজ আর অবকাশের প্রহরে প্রহরে আমাদেরও কাছে হঠাৎ — কোন কোনদিন খবর আসে 'আজ পাবে দেখা'। কোনকালেই যার খবর পাওয়া যায় না, সে আসবে বলে বসে থাকি। থেকে থেকে মনে হয়, নৌকোটি এবার কি দুলে উঠল? রশিতে টান পড়ল? এবার কি তবে চেনাঘাটের নৌকোটিতে পা ফেলা যায়? 'কখন তুমি আসবে ঘাটের' পরে/বাঁধনটুকু কেটে দেবার তরে/অস্ত রবির শেষ আলোটির মতো/ তরী নিশীথমাঝে যাবে নিরুদ্দেশে।'

'তিনটে শালিখ ঝগড়া করে/ রান্না ঘরের চালে'—

যাব তো। নিরুদ্দেশেই ভেসে যেতে চাই কতজনই। তরীটি নিয়ে ভেসে পড়লেই হলো। কিন্তু, ভেসে পড়বো ভাবলেই কি ভেসে যাওয়া যায় না কি? ফিরে তাকাতে হবে তো একবার। ঘর গৃহস্থালির দিকে। সেখানে কত মায়া জমে আছে! যে এপারটিতে নির্বাসন বা প্রবাস মনে হয়েছিল, তারই এপাশ - ওপাশ থেকে ঠিকরে ওঠে থাকতে বলার মায়া।

মেঘ কেটে তাই আলোয় ভেসে যাচ্ছে সকাল। রান্নাঘরের চালে তিনটে শালিখ ঝগড়া করছে। কখনো - বা ছাদের উপর শীতের রোদে ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে মেলে দিচ্ছে বেগ্‌নি রঙের শাড়ি। আর, সকলে নয়, কিন্তু কেউ কেউ ঠিকই জানে যে সেই ছাদের ওপারেই আছে তেপান্তরের মাঠ, তার ধারে কাছেই কোথাও রাজার বাড়ি। রাজার বাড়ির তীব্র রহস্যময়তা আমাদের টান দেবেই। কিন্তু, রোদ্দুরের উড়তে থাকা ঐ বেগ্‌নি রঙের শাড়িটি! ওর গন্ধেই মিশে আছে এপারের এই জীবনের মাধুরী। 'সেদিন ভোরে দেখি উঠে। বৃষ্টি বাদল গেছে ছুটে/ রোদ উঠেছে ঝিলমিলিয়ে/ বাঁশের ডালে ডালে/ ছুটির দিনে কেমন সুরে/ পূজার সানাই বাজে দূরে/ তিনটে শালিখ ঝগড়া করে/ রান্নাঘরের চালে, / শীতের বেলায় দুই পহরে/ দূরে কাদের ছাদের' পরে /ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয়/ বেগ্‌নি রঙের শাড়ি।'

এইসব নানা চেনাশোনার সুতোয় জড়িয়ে থাকবার টানের কথা মনে হলে আমরা বরং আরেকবার ফিরে তাকাবো সহজপাঠের দিকে। চোখ পড়বে জল থৈ থৈ দুর্গানাথের উঠোনে। কর্ণফুলি নদীতে বান ডেকেছে। দুর্গানাথের বাড়ির বেড়া ভেঙে পড়েছে। পাঁকে দাঁড়িয়ে থাকা গোরুগুলোর দুর্গতির শেষ থাকে না। দুর্গানাথের বেড়া ভেঙে গেলো বটে। কিন্তু, জিয়ল গাছের বেড়াটি আছে যে পুকুর কোণে, তার ধারটিতে গিয়ে আমাদের দাঁড়াতে হবে। কারণ, ওখানেই হবে বনবাসের লীলা। বনবাসের কে সঙ্গে যাবে? মা যাবে। আর মা থাকবে বলেই কিছু দায়িত্ব তো নিতেই হবে। দিনরাত কোমর বেঁধে মাকে পাহারা দিতে হবে। আর মা'র হাত থেকে বনের হরিণেরা এসে খই খেয়ে যাবে, ফল্‌সাবনে নাচ দেখিয়ে যাবে ময়ূরেরা। শালিখগুলি কিচিরমিচির করবে আর 'কাঠবেড়ালি ল্যাজটি তুলে/হাত থেকে ধান খাবে।'

জিয়ল গাছের বেড়ার ধারের এই বনবাস ক্ষেত্রটিকে আমরা কেউ ভুলি না, কারণ এখানেই এসে মিশে যায় জীবন আর রূপকথা। ঠিক যেমন আমরা কখনো ভুলতে পারি না অঞ্জনা নদীতীরের চন্দনী গ্রামটি, আর সেই গঞ্জের বাঁয়ে জীর্ণ ফাটল ধরা পোড়ো মন্দিরটির কথা। সে' মন্দিরে ঠাঁই নিয়েছে স্বজনহীন এবং অন্ধ কুঞ্জবিহারী। তার বুকের কাছে ধরে থাকা একতারার সুর, ভোরবেলায় সাতকড়ি ভঞ্জর মস্ত দালান ভ'রে ছড়িয়ে পড়া কীর্তন আর খঞ্জনীর সংগীত, মহাজনী নৌকো থেকে ছড়িয়ে পড়া পশ্চিমী-মাল্লাদের মাদলের ধ্বনি আর শরতের সোনারঙের রোদের সঙ্গে মিশে যাওয়া উদার আগমনী গান, —এইসব মিলে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকথার উপর সৌন্দর্যের একটা চিরকালীন আলো এনে ফেলে।

এইসব ছবি আর গানের মধ্যেই ধরা থাকে জীবনের সঙ্গে আমাদের সব নিয়ে জড়িয়ে থাকার গল্প। খইয়ের গন্ধ, শালিখের ডাক, কাঠবেড়ালির ধান খেয়ে যাওয়া, অন্ধ গায়কের আর্ত সুর - এই সবকিছুতেই জমাট হয়ে ওঠে সেই গল্পের আয়োজন। আর, তার ভিতর দিয়েই রবীন্দ্রনাথ বুনে দিয়ে যান নিকট এবং দূরকে। বেগ্‌নি রঙের শাড়ির আর তেপান্তরের মাঠ। দূরের ঈশারা নিয়ে ডেকে যাওয়া ফেরিওয়ালারা, কাছের পুকুর পাড়েই বনবাসের দূরত্ব রচনা, দূর থেকে দূরে চলে যাওয়া আগমনীর সুর—এই সবকিছুর ভিতর দিয়েই একদিকে যেমন একটা উদাস, মন - কেমন - করা সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, তেমনি আবার জীবনের তাপও একটু একটু করে বুকেরা মধ্যে এসে লাগে।

ঠিক যেমন বাড়ির প্রবীণ সদস্যরা শিশুকে নিয়ে আসেন বয়স্কদের গল্পগুজবের আসরে, আর তাদের কোল ঘেঁসে বসে চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে খেতে খেতে, বড়দের গল্পের আনাচ - কানাচ বেয়ে সমাজ-সংসারের ঘ্রাণের ভিতর

আস্তে আস্তে নাক ডুবিয়ে দেয় সেই শিশুটি; সহজপাঠও সেভাবেই প্রথম আমাদের হাত ধরে নিয়ে যায় লৌকিকতা - অলৌকিকতায় ঘেরা বিরাট বিশ্বসংসারের কাছে। আমাদের পাঠজগৎ এবং আমাদের মধ্যে একটি শ্বাসবিনিময়ের সম্পর্ক তৈরি হয় এখানে। বর্ণ আর ধ্বনির সঙ্গে ব্যক্তি এবং সমাজের ছেদহীন বিনিময়ের কাছে এনে হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে যায় সহজপাঠ। উৎসবে, ঢাকে-ঢোলে, খাজা-গজায় একদিকে সে যেন পুরাকথার একটা বিরাট চালচিত্র হয়ে ওঠে, তার মধ্যেও অবশ্য সামাজিকতার একরকম অম্লান-আয়োজন থাকে। অন্যদিকে, গ্রাম থেকে শহরে রাজমিস্ত্রির পেশায় খাটতে আসা এক কিশোরের চোখ দিয়ে দেখা নগরদর্শনের, কাত্যায়নী বা কাটুরিয়া সর্দারের নীতিবোধে, উদ্ধবের অসহায়তায় বাস্তবগ্রাহ্য একটা জীবনের ছবি ধরা পড়ে।

এইসব উপার্জন নিয়ে বড় হ'তে হ'তে দেখি, কখন আমার সঙ্গে হেঁটে এসেছে সহজপাঠেরই দু'চারটি লাইন— 'নদীর ঘাটের কাছে নৌকো বাঁধা আছে' অথবা হয়তো 'কল্লোলে কোলাহলে জাগে এক ধ্বনি' কিংবা 'কখনো হবে না সে কি ভাবি যাহা মনে?' এসব লাইন হঠাৎ নিজের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় আমাদের। তখন তার ভিতর দিয়ে আরেকভাবে পড়ে নিতে হয় জীবনের মগ্নকথা।

প্রথম পাতার '*' চিহ্নটির জন্য—

বিশ্বভারতীর প্রকাশিত 'সহজপাঠ'-এর স্পষ্টই বলা হয়েছে — 'নন্দলাল বসু কর্তৃকক চিত্রভূষিত এই বই বর্ণপরিচয়ের পর পঠনীয়।'

'বর্ণপরিচয়' প্রথম সংস্করণ হয়েছিল ১৯১২-তে। এর পঁয়ত্রিশতম সংস্করণেও দেখা যাবে যে এখানে শিক্ষার্থীকে স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে এবং বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষা নিয়ে তারপর বর্ণযোজনার মাধ্যমে 'কর' 'খল' 'গণ' ইত্যাদি শব্দ গঠন শেখানো হয়েছে। বইটির ষষ্টিতম সংস্করণের (১৯৩২) বিজ্ঞাপনে ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা জানিয়েছেন 'আবশ্যক বোধ হওয়াতে এই সংস্করণের কোন কোন অংশ পরিবর্তিত হইয়াছে।'

এবার দেখা গেলো, স্বরবর্ণগুলিকে চেনাতে গিয়ে 'অ' -এর সাশে 'অজগর', 'আ' -এর 'আনারস', 'ই' এবং 'ঈ' -র পাশে যথাক্রমে 'ইদুঁর', 'ইগল' ইত্যাদি শব্দ যুক্ত হয়েছে। তবে এই অজগর, ইঁদুরেরা সকলেই এখানে যেন নিষ্ক্রিয়, নামবাচক বিশেষ্য মাত্র। অথচ আমাদের সকলেরই স্মৃতিতে এবং কানে রয়ে গেছে 'অ -এ অজগর আসছে তেড়ে'-র মতো লাইন। এর কাছে বর্ণনা আছে 'আদর্শলিপি'তে। বসাক বুক স্টোর প্রকাশিত আদর্শলিপিতে আছে — 'অজগরটি গাছের ডালে, আমটি গাছে আছে ঝুলে' ইত্যাদি। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুশি' হয়তো এর দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়ে লিখলো—

অজগর আসছে তেড়ে
আমটি আমি খাবো পেড়ে...
এক্কা গাড়ি খুব ছুটেছে
ঐ দেখ ভাই চাঁদ উঠেছে ইত্যাদি